দুর্বুদ্ধি

আমর মিত্র

গল্পগুচ্ছের 'দুর্বুদ্ধি' লেখ হয়েছিল ভাদ্র ১৩০৭-এ। আজ থেকে ১০৮ বছর আগে লেখা এই ক্ষীণকায় গল্পটি যে এখনো, স্বাধীনতার বাষষ্টি বছর বাদেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তা পুনঃপাঠে টের পাওয়া গেল। জমিদারি - কাছারি পরিদর্শনকালে পূর্ববঙ্গের গ্রামগঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে যে অভিজ্ঞতা দিয়েছিল তার এক চিহ্ন 'দুর্বুদ্ধি' গল্পটিতে। আমলাতন্ত্র পুলিশের কঠিন শৃঙ্খলে আমাদের জনসমাজ যেভাবে বাঁধে তার কথা এখনো লেখা হয়। রাষ্ট্র তার ক্ষমতা ধরে রাখে পুলিশ মিলিটারি দিয়ে, আর ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করে তোলা হয়। পুলিশকে ক্রমশ ক্ষমতাবান করে তুলে। অস্ত্র এবং তথাকথিত আইনের বলে প্রাপ্ত ক্ষমতা পুলিশকে করে তোলে স্বেচ্ছাচারী, নিষ্ঠুর, এবং হিংস্রও। সেদিক দিয়ে সেনাবাহিনী জনসমাজ থেকে দূরে থাকার দরুন অতটা থাবা বসাতে পারে না। কিন্তু যেখানে পারে তার চেহারাও ভয়ানক হয়ে ওঠে। এই রূপ স্বাধীনতার পর থেকে জনসমাজ দেখে আসছে। সে বিদ্রোহ দমনে হোক, দাঙ্গায় হোক।

আমাদের যে নাগরিক সমাজ তাকে নানা আইনকানুন মেনে জীবন নির্বাহ করতে হয়। আইনকানুন সংবিধান এসব নাগরিক মানুষের জীবন রক্ষা কর সত্য। আইন প্রয়োগ করে আমলা এবং পুলিশ। ফৌজদারি আইন প্রয়োগ হয় পুলিশের দ্বারা। পুলিশ থাকে নাগরিক মানুষের (সিটিজেন) জীবনকে নিরাপত্তা দিতে। কিন্তু তার জন্য পুলিশকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তার অপপ্রয়োগের মুখোমুখি হতেই আমরা অভ্যস্ত।

পুলিশ আমলাতন্ত্র আমাদের ভাষার গল্পে বারবার এসেছে। কখনো তাকে দেখা হয়েছে ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে, কখনো তার নিষ্ঠুর রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এ নিয়ে নানারকম কথাও ওঠে, বিশেষত রাষ্ট্র ক্ষমতাধারীদের কাছ থেকে, পুলিশের ভাল কাজের কথা কেউ তো লেখেন না। তাঁরা ভুলে যান বেতনভোগী ক্ষমতাভোগী পুলিশকে বেতন এবং ক্ষমতা আর উর্দি দেওয়া হয় ভাল কাজের জন্যই— তাঁরা সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দেবেন, এই ভেবে। আদতে তা হয় না। হয় না কেন না ক্ষমতা ব্যক্তি মানুষের ভিতরে অজ্ঞানতার অন্ধকারের জন্ম দেয়। ক্ষমতা আরো ক্ষমতা চায়। আরো ক্ষমতার জন্য যত নিষ্ঠুরতা সম্ভব তার দিকেই এগোয় মানুষ। এ অভিজ্ঞতা যেমন পুলিশ আমলাতন্ত্রে সত্য, রাষ্ট্র ক্ষমতাধারী সে নির্বাচনে জিতে আসুক ব বিপ্লবের মাধ্যমে আসুক—একই ভাবে সত্য।

১৩০৭ এ লেখা 'দুর্বুদ্ধি' গল্পটি কী? পূর্ববঙ্গের এক গঞ্জে থানার পাশে বিপত্নীক ডাক্তারের বসবাস মাতৃহারা কন্যাটিকে নিয়ে। ডাক্তার এক সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত। থানার দারোগাবাবুর সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব। সত্যি কথা বলতে কী ডাক্তার আর দারোগাবাবু পারস্পরিক প্রীতি অনেক ক্ষেত্রে গরিব মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। দারোগাবাবু একটি দূরসম্পর্কের অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যাকে পুনর্বিবাহের জন্য সে মাঝে মধ্যে ডাক্তারকে অনুরোধ করে চাপ দেয়। কিন্তু মাতৃহারা কন্যা মালীকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করতে চায় না ডাক্তার। এড়িয়ে যায় বারবার।

ডাক্তার এবং দারোগার প্রীতি উভয়কে আর্থিক সমৃদ্ধি দেয় ডাক্তারের মনে ভিতরে নতুন দার পরিগ্রহের বিষয়টি খেলা করে। কন্যা শশীকে পাত্রস্থ না করে তা সম্ভব নয়। শশীর বয়স বারো হয়ে গেল। ডাক্তার নানা বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়। মিষ্টি খেয়ে বিষণ্ণ হয়ে বাড়ি ফেরে। শরীর বিবাহের জন্য ভালরকম টাকা দরকার। টাকা কীভাবে জোগাড় হবে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

'সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে, শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিশ তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।'

দারোগার সঙ্গে গল্পকথক ডাক্তারের প্রীতির সম্পর্ক তাই দুঃস্থ হরিনাথ মজুমদার ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। সুযোগসন্ধানী ডাক্তার বোঝে তার সামনে এতবড় সুযোগ আর আসবে না। সে হরিনাথকে কল্পিত ভয়ে হিম করে দিয়ে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে। সরল মানুষ হরিনাথ ডাক্তারের অনুগত হয় আর ডাক্তার প্রত্যাশা পূরণের পর কন্যা শশীর বিবাহের ব্যবস্থা করে। হ্যাঁ, বৃদ্ধ হরিনাথ যখন বিপদে পড়ে, পুলিশের ভয়ে ছুটে এসে ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। শশী বাবাকে জিজ্ঞেস করেছে, কী হয়েছে, বুড়ো মানুষটি তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে কেন?

বিবাহের ব্যবস্থা হল। গায়ে হলুদের রাতে শশীকে ওলাওঠায় ধরল। অসুস্থ কন্যার মুখ দেখে

ডাক্তার টের পায় নিজের পাপকর্মের কথা। মনে পড়ে যায় হরিনাথ মজুমদার যখন তার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল, শশীর প্রশ্নের কথা। অনুশোচনায় ডাক্তারের মনে হয় শশীর এই অবস্থার জন্য সে দায়ী। ছুটে গিয়ে হরিনাথের পা জড়িয়ে ধরে ডাক্তার, আর্তনাদ করে ওঠে, 'মাপ করো দাদা, এই পাষন্ডকে মাপ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর নাই।'

ডাক্তার বলে, নিরপরাধে সে হরিনাথের সর্বনাশ করেছে, সেই পাপে তার কন্যা মরেছে। হরিনাথের চটিজুতো খুলে নিয়ে ডাক্তার নিজের মাথায় মারে। উন্মাদের মতো হয়ে যায়। শশীকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঢলে যেতে দেখে। পরদিন সকালে শশীর মৃত্যু হয় গায়ে হলুদের চিহ্ন নিয়ে। আর তার পরদিনই দারোগা এসে বলে, 'ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেল। দেখাশুনার তো একজন লোক চাই।'

গল্পকথক ডাক্তার বলছে : 'মানুষের মর্মান্তিক দুঃখ শোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা শয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে, কোনো কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

ডাক্তারের ভিতরে পরিবর্তন আসে কন্যার মৃত্যুতে। একা একা ঘরে বসে শশীর সেই কথা মনে পড়ে ডাক্তারের— 'বাবা, ঐ বুড়া তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল।' ডাক্তার হরিনাথের ভগ্নকুটির নিজে খরচ মেরামত করে দেয়, নিজের দুধেল গাইটি হরিনাথকে দিয়ে দেয়। মহাজনের হাতে বন্ধক থাকা জমি উদ্ধার করে ফেরত দেয় হরিনাথকে। গরিবের চিকিৎসার জন্য টাকা নেওয়াও বন্ধ করে ডাক্তার। কোনো বালিকার অসুখ হলে মনে হয় যেন শশীই সেই রোগ ভোগ করছে।

এক বর্ষায় যখন সমস্ত পল্লি ভেসে গিয়েয়ে জলে, ডাক্তারের ডাক পড়ে জমিদারের কাছারি থেকে। বাবুদের মাঝি পান্সি নিয়ে এসে হাঁক মারতে থাকে। বাবুর পান্সির মাঝি বুবুর ঔদ্ধত্যেই যেন বিলম্ব সহ্য করতে পারে না।

নৌকোয় উঠবে ডাক্তার। দেখল থানার ঘাটে ডোঙা বাঁধা। ডোঙায় এক দূর গ্রামের চাষা বৃষ্টিতে ভিজছে। তার কন্যাকে আগের রাতে সাপে কেটেছে। থানায় রিপোর্ট করতে হবে, মৃত কন্যাকে বয়ে নিয়ে এসেছে থানায়। নিজের গায়ের কাপড় খুলে মৃত দেহটি ঢেকে রেখেছে। ডাক্তার চিকিৎসার কাজ সেরে দুপুরে ফেরে। দেখল একই দৃশ্য। কৌপীনসর্বস্ব চাষা বৃষ্টিতে ভিজছে। থানার কাজ মেটেনি। তাকে ভাত পাঠায় ডাক্তার। সে ভাত ছুঁয়ে দ্যাখে না। ডাক্তার আবার বেরোয়। সন্ধ্যার সময় ফিরেও দ্যাখে একই দৃশ্য। লোকটা মৃতদেহ নিয়ে বসে আছে। সমস্ত দিনের কাজ মেটেনি। এক সময় একটি কনস্টেবল এসে জিজ্ঞেস করেছিল ট্যাঁকে কিছু আছে কিনা। নিতান্ত দরিদ্র চাষা দিতে অপারগ হওয়ায় কনস্টেবল বলে গেছে বসেই থাকতে।

এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। আগেও দেখেছে ডাক্তার। কিন্তু এই দিন না পেরে দারোগাবাবুর কাছে ছুটে যায়। দারোগাবুব তখন আরামে গুড়গুড়ি টানছিল। ডাক্তার বলে ওঠে, দারোগা মানুষ না পিশাচ! নিজের উপার্জনের টাকা ফেলে দিয়ে বলে ওঠে, টাকা নিক দারোগা, নিয়ে ওই চাষাকে মুক্তি দিক। সে সাপেকাটা মেয়েটির সৎকার করুক।

দারোগা তাকে ভিটেছাড়া করে শেষ পর্যন্ত। তার আগে ওই আচরণের জন্য ডাক্তার বহুবার ক্ষমা চেয়েছে, হয়নি কিছুই। দারোগা গলেনি। তাকে ভিটেছাড়া করেই শোধ নেয়।

এই গল্প কি এই সময়ে ২০০৯-এ লেখা হতে পারত না? সমস্ত গল্পটি লেখা তির্যক ভঙ্গিতে। ডাক্তারের দুর্বুদ্ধি হয়েছিল তাই দারোগাকে অপমান করতে সাহস পেয়েছিল, ফল ভোগ করল সে। গল্পটি আড়াই পাতার। কাটা কাটা ছোট ছোট বাক্য লেখা। এ গল্পে কোনো উচ্ছ্বাস নেই, আবেগ নেই, আছে নির্মোহ হয়ে সত্য উচ্চারণ। আর আছে কন্যা হারা পিতার শোক অশ্রুর অস্পষ্ট চিহ্নগুলি।

বুড়ো চাষা মৃতদেহ নিয়ে সমস্ত দিন বসে আছে। বর্ষার দিন দারোগা ঘরে বসে গুড়গুড়ি টানছে। টাকা না হলে সৎকারের অনুমতি দেবে না। এত ভয়ঙ্কর গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। অনেক দিন আগে হাসান আজিজুল হকের 'পাতালে হাসপাতালে' পড়ার স্মৃতি ভেসে এল। সেও তো হাসপাতালে রোগী নিয়ে দিনভর অপেক্ষা। তারপর নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানে ফিরে আসা। হাসান সায়েবের আরো একটি গল্প পড়েছি, এমন নির্দয় পৃথিবীকে নিয়ে। গল্পের রূপ - ঘটনা হয়ত বদলেছে, কিন্তু এই ১০৮ বছরের পুরনো গল্প বুঝি বদলায়নি। সমাজটা বদলায়নি তো, বদলাবে কী করে? দেশ শাসনের জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠী এই ভিন দেশ দখলে রাখার জন্য যে যে আইন, ম্যানুয়াল বা কর্মপদ্ধতি তৈরি করেছিলেন, স্বাধীনতার পর তার ঠিক কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, স্বদেশের মানুষ স্বদেশকে শাসন করছে মনে হয়?

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি জীবনে সন্তান হারা পিতা ছিলেন। কন্যা সন্তান এবং পুত্রসন্তান তাঁকে হারাতে হয়েছিল। এই গল্পে বুঝিবা তার ছায়া পড়েছে। ডাক্তারের ভিতরে যেন আমি আর এক কন্যাহারা পিতার সন্ধান পাই। পল্লিতে যখন রোগ দেখা দেয়, ডাক্তার অনুভব করে শশী যেন সমস্ত রোগে জর্জরিত হয়ে আছে। আবার যে বালিকাটির সাপে কাটা মৃতদেহ বয়ে এনেছিল ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মতো।'

বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তব। ভয়ঙ্কর বাস্তব।

গল্পটি আরম্ভ হয়েছে এইভাবে: 'ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তা খোলসা করিয়া বলিব না, আভাস দিব মাত্র।'

গল্পটি ভিটে থেকে উচ্ছেদ হওয়ার। উচ্ছেদ হয়েছিল ডাক্তার। তার কারণ তার দুর্বুদ্ধি। দুর্বুদ্ধিটা কী, তা আগেই বলেছি, দারোগা বাবুর বিরোধিতা। ক্ষমতা কোনো স্পর্ধা সহ্য করে না। দারোগার সঙ্গে তার যতই প্রীতি থাক। দারোগা ক্ষমতা আর অন্ধকারের প্রতিভু, সেখানে ডাক্তারের ওই আচরণ একেবারেই স্বাভাবিক নয়, আসলে এই দারোগার ক্ষমতার নানা রূপ আমরা সতত দেখতে পাই। কখনো চূড়ান্তভাবে কখনো আলগা অস্পষ্টভাবে। গল্পটি আমাকে এখনো তাড়িত করে। মনে পড়ে যায় সমস্ত দিন সাপেকাটা বালিকা কন্যাটিকে নিয়ে বসে আছে লোকটি, বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছে। বৃষ্টিতে সে ভিজছে মৃত কন্যাটিও ভিজছে। তার উপরে চাপা দিয়েছে নিজের গাত্রবস্ত্র। লোকটি কৌপীন পরিহিত চাষা। এ মুখ কতবার কতজায়গায় দেখেছি। এই রকম মানুষকে প্রতারিত হতে কত দেখেছি আমরা। ভিটে আর হালের গরু বেচে জমি রেকর্ড করতেও শুনেছি, চাষা নিজে বলেছে। সময় বদলে গেছে। পৃথিবী আরো ঝকঝকে আধুনিক হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর অসুখটা আরো বেড়েছে বই কমেনি। শাসনের জন্য অত্যাচার প্রয়োজন হয়, এ এক বন্ধুর কথা। সে বলেছিল, পুলিশকে যদি ভয়ই না করবে মানুষ পুলিশ শাসন করবে কী করে? আর ভয় পাওয়ানোর জন্য পুলিশকে নিষ্ঠুর হতে হয়। জানি না কেন এই নিষ্ঠুরতা নেমে আসে কৌপীন পরা চাষার উপর। আসলে ক্ষমতার ব্যবহার জানে না ক্ষমতা।

আর একটি কথা 'দুর্বুদ্ধি' নতুন করে পড়ার পরে মনে পড়ল, মানুষের উপর মানুষের রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্ঠুরতা আমাদের গল্পে এখন ছায়া ফেলে না। আমরা শপিং মলের গল্প বলি, বলি না যে বন্ধ কারখানাটির জমিতে, যে বস্তি উচ্ছেদের জমিতে গড়ে উঠেছে তা, সেই ভিটে হারা মানুষগুলির কথা। সে তো এক এক সময় বোবা চোখে এসে দাঁড়ায় সাউথ সিটি বা অমন কোনো মলের সামনে, কী মনে হয় তখন? তার মুখখানি কি আমরা দেখেছি কখনো? না, আমি তো নইই। অথচ ৩৫ বছর আগে যখন লিখতে আরম্ভ করি এইসব মুখই না তাড়িত করত! এখন করে না কি? করে কিন্তু ভুলে যেতে চাই। ডিস্টার্বিং লেখা হারিয়ে যাচ্ছে চারপাশ থেকে। 'দুর্বুদ্ধি' 'শাস্তি' থেকে 'দ্রৌপদী' (মহাশ্বেতা) বারবার পড়া দরকার চারদিকটাকে, আমাদের বেঁচে থাকাকে স্পষ্ট করে তুলতে।